# তাদাব্বুরের সরোবরে

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# সূচি


| | |
|---|---|
| শুরুর আগের আলাপন | ৯ |
| তাদাব্বুরের সরোবরে | ১১ |
| সালাতের তাদাব্বুর | ৩৫ |
| ভারসাম্যতার শিক্ষা | ৩৮ |
| দুনিয়ার হাকিকত | ৪০ |
| বাক্কা নামের রহস্য | ৪৩ |
| ইকামাতুস সালাত | ৪৬ |
| বিয়ের জন্য দুআ | ৪৯ |
| অর্থ সর্বদা অনর্থ নয় | ৫২ |
| সম্পদ ও সন্তান | ৫৭ |
| সবর ও সালাত | ৫৯ |
| নবিজির প্রতি আল্লাহর সম্মানপ্রদর্শন | ৬১ |
| ইউসুফি সৌজন্যতা | ৬৪ |
| আকস্মিক মৃত্যু | ৬৬ |
| কলবুন সালীম | ৭০ |
| নবিপ্রেমের দাবি | ৭৩ |
| দানের ধরন | ৭৮ |
| নেককার হওয়ার ৭টি বৈশিষ্ট্য | ৮১ |
| ভালো কাজে বিলম্ব নয় | ৮৫ |
| তবুও কথা বলতে হবে | ৮৯ |
| কুরআনের সাথে সম্পর্ক | ৯২ |

কুরআনি প্রেসক্রিপশন ৯৫
অন্তরের থার্মোমিটার ৯৮
লো রিস্ক ও ইসলামের মেজাজ ১০১
শাসক হওয়ার মাপকাঠি ১০৩
মতভিন্নতার রসায়ন ১০৫
কুরআনের সহজবোধ্যতা ১০৯
সদুপদেশ ১১২
আত্মপ্রবঞ্চনা ১১৫
ইফক ১১৮
কুরবানির দীক্ষা ১২১
তিনটি বড় পাপ ১২৬
ইবরাহিম عليه السلام কি স্বপ্ন বুঝতে ভুল করেছিলেন? ১২৯
রমজানে কর্মজীবীদের কুরআন তিলাওয়াত ১৩৫
ইহুদিরা আজীবনই অভিশপ্ত ১৩৮
হিফজ শিক্ষার্থীর বাবা-মায়ের জন্য ৮টি পরামর্শ ১৪২
উচিত শিক্ষা ১৪৫
শব্দ ব্যবহারে সচেতনতা ১৪৭
আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন ১৫০
কুরআন বোঝা কতটুকু সহজ ১৬০
মূসা নবির পাঠশালাতে ১৬২

# তাদাব্বুরের সরোবরে

কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আমার খুব প্রিয় একটি কাজ। এটি করি হৃদয়ের খোরাকের জন্য। তিলাওয়াতকালে কুরআন কত রঙের কত কিছু যে তুলে ধরে সামনে, তার ইয়ত্তা নেই। 'তাদাব্বুরের সরোবরে' শিরোনামের অধীনে মূলত টুকরো টুকরো কুরআনি তাদাব্বুরগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

## পরোপকারের নীতি

মূসা عليه السلام-এর হাতে একবার ফিরাউনের বংশের এক ব্যক্তি নিহত হয়। ফলে তিনি প্রাণ-ভয়ে মিশর ছেড়ে মাদায়েন চলে আসেন। সেখানে তাঁর পরিচিত কেউ ছিল না। কোথায় মাথা গুঁজবেন জানতেন না। কার কাছে ঠাঁয় নিবেন চিনতেন না। একেবারে অচেনা অজানা এক দেশ। অনিশ্চিত গন্তব্য। পথিমধ্যে এক জায়গায় দেখলেন, অনেক মানুষ তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে ব্যস্ত। সেখানে লোকজনের ভিড়ের কারণে সম্ভ্রান্ত দুই মেয়ে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছে না। তারা একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এটা দেখে তিনি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তাদেরকে পানি সংগ্রহ করে দিলেন। সাহায্য করার পর তিনি কী করলেন—এই বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে,

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

> "তখন মূসা তাদের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিলো। তারপর ছায়ায় ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।'"[১]

[১] সূরা কাসাস : ২৪

দেখুন, তিনি তাদের থেকে কোনো প্রশংসা বা সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা না করে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। অথচ সেই সময় সামান্য একটু সহায়তা তাঁর অনেক দরকার ছিল। একে তো ভিনদেশ, তার ওপর নিজের কাছে খাবারের মতো কোনোকিছুও ছিল না।

এর থেকে বোঝা যায়, কারও উপকার করার পর তার থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাওয়ার প্রত্যাশা না রাখা উচিত। এর প্রতিদান কেবল আল্লাহর কাছে—এমন বিশ্বাস ধারণ করতে পারলে একসাথে একাধিক ঝামেলা এড়ানো সম্ভব। যেমন, কৃতজ্ঞতা না পেলে মন খারাপ হবে না। মানুষের উপকার করার মানসিকতা নষ্ট হবে না। মনের কোনায় নানান রকম অভিযোগ বাসা বাঁধবে না। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে ইত্যাদি।

## উম্মতের প্রতি নবিজির ভালোবাসা

আমাদের নবি ﷺ তাঁর উম্মতকে ঠিক কতটা ভালোবাসতেন, এটা তাঁর হতভাগা উম্মত ভালো করে অনুধাবন করতে পারে না অনেক সময়। এই বিষয়ে কুরআন থেকে ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

বনি ইসরাঈলের কাছে পাঠানো হয়েছিল হজরত মূসা ﷺ-কে। আল্লাহর এই নবি নানানভাবে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর উম্মতকে সোজা করতে। পুরোপুরি সক্ষম হননি। এরা সারা জীবন তাঁর সাথে বেয়াড়াপনাই করেছে। কখনো জিহাদের ময়দানে গিয়ে মুখের ওপর ঠাস করে বলে দিয়েছে,

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

> "আপনি আর আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করেন, আমরা এখানে বসে আছি।"[২]

কখনো তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে বেশ ভালোই অতিষ্ঠ করেছিল তাঁকে। তিনি একসময় বলেই বসলেন,

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

> "নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন। তিনি আমাকে সুপথ দেখাবেন।"[৩]

---

[২] সূরা মায়িদা : ২৪
[৩] সূরা শুআরা : ৬২

মানে তোমরা যদি একজনও আমার সাথে না থাকো, তবুও তেমন আফসোস নেই। তোমাদের এই না থাকা আমাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করবে না এবং আমাকে হতাশও করবে না। যেহেতু আমার রব আমার সাথে আছেন, সুতরাং তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।

এবার আসুন আমাদের প্রাণের প্রিয় নবি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরাই। তিনি হিজরতের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। কাফিররা তাঁদের সন্ধান পায় কি না—এই চিন্তায় আবু বকর رضي الله عنه খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। সেই সময় আবু বকর رضي الله عنه-কে নবিজি ﷺ এই বলে অভয় দিয়েছিলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

> "ভয় পেয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।"[৪]

এই সান্ত্বনার বাণী শুধু এক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যই না, বরং তাঁর আগত সকল উম্মতের জন্যই। তিনি একা নিজের কথা বলেননি। 'আল্লাহ আমার সাথে আছেন' না বলে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' বললেন এবং নিজের সাথে পুরো উম্মতকেও জড়িয়ে নিলেন স্নেহ-মায়ার চাদরে।

এই স্নেহ-মায়া-মমতার সাক্ষর তিনি শুধু এখানে না, স্বীয় জীবনে বার বার রেখেছেন। সামনেও রাখবেন। সকল নবিরই বিশেষভাবে একটা দুআ করার সুযোগ ছিল, যা কবুল হবে। সেই দুআকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু আমার-আপনার নবি সরওয়ারে দোজাহান সেই সুযোগটা উঠিয়ে রেখেছেন তাঁর উম্মতের সুপারিশের জন্য। কিয়ামতের মাঠে যখন সকল নবি ও সাধারণ মানুষ 'ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!' করবে, তখন আমাদের নবি কাঁদতে থাকবেন উম্মতের চিন্তায় বিভোর হয়ে। কিভাবে তাঁর উম্মতের প্রতিজন সদস্যকে কিয়ামতের এই কঠিন মাঠের ততোধিক কঠিন পরীক্ষায় পাশ করিয়ে জান্নাতের চিরসবুজ উদ্যানের বাসিন্দা করা যায়—সেই ভাবনা তাঁকে করে রাখবে বিচলিত। তিনি সিজদায় পড়ে অঝোর ধারায় কান্না করবেন। মহান রবের কাছে আর্জি জানাবেন। না, নিজের জন্য কোনোকিছু না, উম্মতের জাহান্নাম থেকে মুক্তিনামা প্রার্থনা করবেন। এত দরদের নবিকে ভালো না বেসে পারা যায়? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

[৪] সূরা তাওবা : ৪০

## শয়তানকে ব্যর্থ করার উপায়

শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তর একেকজন হয়তো একেকভাবে দিবেন। তবে কুরআন আমাদের সামনে এই প্রশ্নের যে উত্তরটি হাজির করেছে, সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আদম ﷺ-কে যখন শয়তান সিজদা করল না এবং নিজের আগুনের তৈরি হবার অহংবোধ তাকে আল্লাহর অভিসম্পাতে নিক্ষিপ্ত করল, তখন সে আর্জি জানাল, যেন তাকে কিয়ামত অবধি হায়াত দেওয়া হয়। আল্লাহ সে আবেদন পূরণ করেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই অপমান সে মেনে নিতে পারেনি। তাই বিদায়ের প্রাক্কালে বলে যায়,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا
عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

> "শয়তান বলল, 'হে প্রভু! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন, তাই আমি পৃথিবীতে মানুষের সামনে অবশ্যই (পাপের পথ) সাজিয়ে রাখব এবং তাদের সবাইকে অবশ্যই বিপথগামী করব; তবে তাদের মধ্য হতে যারা আপনার মুখলিস বান্দা, তারা ব্যতীত।'"[৫]

এখানে শয়তান তার দুর্বলতার বর্ণনা দিয়েছে। সবাইকে ধোঁকায় ফেলা ও পথভ্রষ্ট করতে পারলেও কাদের ক্ষেত্রে তার কূটকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, সেটা নিজেই বলে দিয়েছে। তারা হলো মুখলিস বান্দা। অর্থাৎ যাদের প্রতিটি কাজকর্মের সাথে ইখলাস মিশে থাকে।

প্রতিটি কাজে ইখলাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ—সেটা শয়তানের এই একটি কথা থেকে বুঝে আসে। এটি কেমন যেন ঢাল স্বরূপ। শয়তানের আক্রমণকে যা খুব সহজেই ঠেকিয়ে দেয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করে ফেলে।

## সুন্দরভাবে কথা বলুন

প্রত্যেক মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা ইসলামের দাবি। চাই সেই মানুষটা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। মানুষ মাত্রই ভালো আচরণ-ব্যবহার পাওয়ার হকদার। অনেকেই ভাবে, মুসলিম হলেই শুধু উত্তমভাবে কথা বলতে হবে। আর অমুসলিম হলে তার সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যাবে। ব্যাপারটি কিন্তু মোটেও

[৫] সূরা হিজর : ৩৯-৪০

তা নয়। মৌলিকভাবে ইসলাম সবার সাথেই সুন্দর আচরণ করার আদেশ দেয়। এটি আমরা বুঝতে পারি কুরআনের একটি ছোট্ট নির্দেশনা থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।"[৩]

এই একটি নির্দেশনার ওপর আমল করার দ্বারা একজন মানুষের পুরো জীবন আলোকিত হয়ে যেতে পারে। তার বহু কঠিন কাজ সহজে সমাধা হতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলে, সবাই তাকে ভালোবাসে। তা ছাড়া মুখের সুন্দর বচন মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে এবং তার মন-মননের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে কঠিন মনের মানুষও মোমের মতো বিগলিত হয়ে যায়। তাই আজ থেকেই নিয়ত করুন, সবার সাথেই সুন্দরভাবে কথা বলব। কাউকে হেয় বা তুচ্ছ করে কিংবা আঘাত করে কথা বলব না। এমনকি যদি কেউ আমাদের সাথে মন্দভাবে কথা বলেও, সে ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করব তার সাথে ভালো কথা বলতে। এই ছোট্ট আচরণ সেই ব্যক্তির হিদায়াতের ওসিলা হয়ে যেতে পারে।

## ফ্রি সাইজ দুআ

কুরআনে প্রচুর দুআ বর্ণিত হয়েছে। কোনোটা স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ শিখিয়েছেন, কোনোটা অন্য কারও দুআ করার ঘটনা উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন। উভয়টাই কুরআনি দুআ হিসেবে স্বীকৃত, গ্রহণযোগ্য ও ফজিলতপূর্ণ। এগুলোর মাধ্যমে দুআ করলে কবুল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

কুরআনে বর্ণিত কিছু কিছু দুআ এতই ব্যাপকার্থক যে, একে 'ফ্রি সাইজ দুআ' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মানে ফ্রি সাইজ-এর জিনিসগুলো যেমন সবার জন্য খাটে, এই দুআগুলো সেরকম ফ্রি-কন্ডিশন। নির্দিষ্ট কোনো জিনিসকে নির্দেশ না করায় সব প্রকারের বিষয়কেই এটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং সব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হতে পারে। যে-কোনো প্রয়োজনে সেই দুআটা ফিট হয়।

এমনই একটি দুআ হলো,

[৩] সুরা বাকারা : ৮৩

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

> "হে আমার রব, যে জিনিসের ভার বইবার শক্তি আমার নেই, তা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।"[৭]

এই দুআটি মানবিক সমস্যার সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম।

আপনি শত্রুর দ্বারা বিপদের আশঙ্কা করছেন। এই দুআটি পড়ুন। বিপদের ভার বইবার অক্ষমতা হিসেবে তা আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে। তিনি কবুল করে নিলে বিপদটা কেটেও যেতে পারে ইনশাআল্লাহ।

প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে আর পারছি না। মাথা ব্যথার অসহ্য যন্ত্রণায় অনেক সময় মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলতে ইচ্ছে হয়। তখন দুআটি পড়ুন। আপনার সহ্যসীমার বাইরে চলে যাওয়া রোগটা আশা করা যায় আল্লাহ কমিয়ে দিবেন।

চলতি পথে পেছন থেকে আরেকটা গাড়ি আপনাকে এসে আঘাত করতে পারে। ফেরানোর ক্ষমতা আপনার নেই। দুআটা পড়ে নিন। আশা করি আল্লাহ আপনার ওপর এমন ঘটনা ঘটাবেন না, যা বহনের শক্তি আপনার সাধ্যাতীত।

সামনে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা। ভালোমতো প্রস্তুতি নেবার পরেও খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। কারণ চাকরিটা আপনার দরকার। বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো নাম্বারে পাশ করাটা জরুরি আপনার জন্য। বেশি বেশি দুআটা পড়ুন। আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে এমন প্রশ্ন থেকে বাঁচাবেন, যেটা উত্তর দেবার মতো সাধ্য আপনার নেই বা পড়লেও এখন ভুলে গেছেন।

মোটকথা, এভাবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, জীবনের সকল জটিল ও কঠিন বিষয়ের টনিক হিসেবে এই কুরআনি দুআটা ভূমিকা রাখতে পারে। এটাও কুরআনের মুজিযার অন্তর্ভুক্ত। এই কুরআন সত্যিই এক অপার বিস্ময়।

## 'নাফফাসাত' এর অনুবাদ-খটকা

সূরা ফালাকের চার নং আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া মিন শাররিন নাফফাসাতি ফিল উকাদ' (وَمِن شَرِّ النَّفَّٰثَٰتِ فِي الْعُقَدِ)। সাধারণত এর অনুবাদ করা হয় 'গিরার মধ্যে ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে'। অর্থাৎ যারা গিরার মধ্যে ফুঁ দিয়ে জাদুটোনা করে অন্যের অনিষ্ট করতে চায়, তাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

[৭] সূরা বাকারা : ২৮৬

হচ্ছে। এই অনুবাদ থেকে অনুমিত হয়, এমন কাজ মহিলারাই করে শুধু; কিংবা তারাই বেশি করে। তাই কাজটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে।

এই অর্থ নিয়ে মনের মধ্যে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাব ছিল। এর কারণ হলো :

ক. যদি ধরেও নিই মহিলারা জাদুটোনার সাথে বেশি জড়িত, তারা কিন্তু সরাসরি নিজেরা তা করে না। বরং কোনো বৈদ্য-ওঝা বা জাদুকরের কাছে যায় এবং তাদের সহায়তা নেয় শুধু। মূলত জাদুটোনার কাজ করে এমন শতকরা ৯০%-ই হলো পুরুষ। তাহলে যারা সরাসরি এগুলো করে—তাদেরকে এড়িয়ে, অন্য যারা ওদের সহায়তা গ্রহণ করে—তাদেরকে কেন ফোকাস করা হবে?

খ. সূরাটা নাযিল হয়েছিল নবি ﷺ-এর জাদু আক্রান্ত হবার প্রেক্ষাপটে। খোদ নবিজিকে যে জাদু করেছিল, সেও একজন ইহুদি পুরুষ ছিল। তারপরেও কেন মহিলাদেরকে টেনে আনা হবে?

পরবর্তীকালে ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ-এর আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে এর সদুত্তর পেলাম। তিনি লিখেছেন, এখানে নাফফাসাত বিশেষণ বা সিফাত। তার মাওসুফ তথা বিশেষ্যটা হলো মূলত নাফস বা আত্মা। এটি পুরুষ-মহিলা—উভয়কেই শামিল করে। নাফসের কথা আনার কারণ হলো, জাদুর যে প্রতিক্রিয়া, এটি মূলত মানুষের আত্মা বা মেজাজ-মানসিকতার ওপর প্রভাব ফেলে। এরপর সেখান থেকে তা দেহকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

## জান্নাতিদের উপহাস

একদিন সকালে কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে একটা আয়াত আমাকে ইমোশনাল করে দিলো। একই সাথে আশা-আশঙ্কা আর হাসি-কান্নার মিশ্রিত অনুভূতি জাগ্রত হলো মনের কোণে। হাশরের মাঠে বিচার-আচার শেষ হবার পর যখন জান্নাতিরা জান্নাতে আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে যাবে, তখন জান্নাতিরা জাহান্নামিদের হাঁক ছেড়ে বলবে,

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا۟ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

> "'আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, সেটাকে সত্য পেলাম। তো তোমাদের কী অবস্থা? তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য

# সালাতের তাদাব্বুর

জামাতের সালাতে ইমাম যখন তিলাওয়াত করে, আমি অর্থটা মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। এতে করে কুরআন বোঝার মজা যেমন উপলব্ধ হয়, তেমনি সালাতে খুশু-খুযুও বৃদ্ধি পায়।[২৯] দেখা যায়, প্রায়শই সেই তিলাওয়াতের কোনো এক অংশে আমার চলমান অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই। কিংবা আক্রান্ত কোনো অন্তরের রোগের ইলাহি ইসলাহের নির্দেশনা পাই।

একদিনের একটা ঘটনা বলি। তাহলে বুঝবেন কুরআন আমাদের জীবনকে কত নিবিড়ভাবে পরতে পরতে নিশ্চুপভাবে নির্দেশনা দিয়ে যায়। প্রয়োজন শুধু চোখ-কান খোলা রেখে সেটাকে গ্রহণ করে নেওয়া।

অনেক সময়ই আমার এমন হয়। হাতের কাজটা থাকে প্রায় শেষের দিকে, নামাজের সময়ও তখন ঘনিয়ে এসেছে। মন বলে, 'কাজটা যেহেতু শেষের দিকে, তাই শেষ করেই তারপর নামাজে যাও।' মনের কথা ধরে কাজ শেষে যখন মসজিদে উপস্থিত হই, তখন হয়তো নামাজের এক-দুই রাকাত শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন নামাজে ইমাম সাহেব এক রাকাতে সূরা জুমুআ থেকে তিলাওয়াত করলেন। এই সূরার যে আয়াতটা আমার মনে দাগ কাটল এবং সন্তর্পণে এই রোগের ব্যাপারে আমাকে নসিহত করে গেল তা হলো,

مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

> "আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উত্তম। আর

[২৯] এটা তখনই সম্ভব, যখন কেউ আরবি ভাষা পুরোপুরি শিখবে এবং কুরআনের অনুবাদ ভালোভাবে পড়বে।

> আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।”[২৭]

যদিও আয়াতে ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক হতে পারে। ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে সকল অনর্থক কাজ অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ব্যবসা যেহেতু জীবিকা উপার্জনের একটা মাধ্যম, তাই এর মধ্যে উপার্জনের আরও যত মাধ্যম আছে—সবগুলোই দাখিল হতে পারে। বিষয়টা চিন্তা করে আমি চমকে উঠলাম। সতর্ক হলাম। আগামীতে নিজেকে শুধরে নেবার পণ করলাম। কুরআনের এমন নসিহত পেয়ে বিগলিত হলাম।

যেই রিযিকের অন্বেষণে একজন ব্যবসায়ী মসজিদে জামাতের সময়েও তার দোকানে রয়ে যায়, নামাজটা শেষ ওয়াক্তে একাকী পড়ে বা একেবারেই পড়ে না, তার মনে যদি ছোট্ট এই আয়াতাংশ গেঁথে যেত, তাহলে এটাই তার আমূল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট হতো। রিযিকের ব্যাপারে কারও মধ্যে যখন একিন পয়দা হয়ে যায় যে—আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিকদাতা, তখন তার বহুমুখী পেরেশানি কমে আসে। অন্তরে অন্য রকম স্থিরতা আর প্রশান্তি কাজ করে।

ইমাম সাহেব সেদিন অন্য রাকাতে তিলাওয়াত করেছিলেন সূরা আহযাবের কিছু আয়াত। সেখানেও একটি আয়াতে বড়সড় দিকনির্দেশনা পেলাম। জীবন চলার পথে যখন মাঝেমাঝে হতাশায় মুষড়ে পড়ি তখন কিভাবে সমাধান পাব, কোন পথ ধরে সামনে বাড়ব এবং আখিরাতের পথে প্রাণচাঞ্চল্যকে সচল রাখব—সেটা বুঝতে পারলাম।

সমাধানটা কী পেলাম, তার আগে সমস্যাটার কথা খোলাসা করি। অনেক সময় আমরা দ্বীনের পথে চলার ও গুনাহমুক্ত থাকার অটল ইচ্ছা পোষণ করার পরেও নফসের সাথে পেরে উঠি না। আমাদের মানবিক দুর্বলতায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় গুনাহ্ ও রবের সাথে নাফরমানি হয়েই যায়। নিজের আমলগুলো কলুষিত হয়ে পড়ে পাপের পঙ্কিলতায়। নিজের সংশোধন হবে না ভেবে মুষড়ে পড়ি। বিষণ্ণতার তরঙ্গতায় আছড়ে পড়ি। অন্তর্দহনের শিখায় জ্বলতে থাকি অনবরত।

এই বিষয়ে কুরআন অনেক সুন্দর একটি প্রেসক্রিপশন হাজির করছে আমাদের জন্য। কুরআন বলছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

[২৭] সূরা জুমুআ : ১১

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করল।"[২৮]

প্রথমত হলো, তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরা। এটা অনেক কঠিন ও কষ্টকর হলেও, সামান্য সবর করে যদি প্রথম ধাপটা পাড়ি দেওয়া যায়, তখন আল্লাহ তাআলা গায়িবিভাবে মনের মধ্যে আলাদা একটা মানসিক শক্তি তৈরি করে দেন। এর মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে আমলগুলোকে সংশোধন করে দেন। নিজের মধ্যকার বদ-খাসলতগুলোকে পরিবর্তন করে দেন।

প্রথম পর্যায়ে যে কষ্টটা হয়, এটা হলো বিনিয়োগ। আর পরে যে আমলের সংশোধন অর্জন হয়, তা হলো লাভ। এটা এক ধরনের ব্যবসা। আল্লাহ হলেন ক্রেতা, আমি-আপনি বিক্রেতা। আমরা যদি একটু কষ্ট করে আমাদের পুঁজিটা তাঁর পর্যন্ত সহিসালামতে পৌঁছে দিতে পারি, তিনি আমাদেরকে এর উত্তম বদলা তো দিবেনই, সাথে আরও বেশি কিছু দিবেন। সেটা হলো মাগফিরাত। বাড়তি পাওনা। এখানেই আল্লাহর মহানুভবতা ও 'রহমান-রহিম' গুণের প্রকাশ ভাস্বর হয়ে উঠে।

তিনি শুধু আপনার আমলের সংশোধন করে দিয়েই ক্ষান্ত হন না, পূর্বে আপনি যে ত্রুটি করেছেন সেটাকেও ঢেকে দেন। বিক্রেতা হিসেবে আমাদের পারফরমেন্স অত্যধিক পছন্দনীয় হলে অনেক সময় তিনি আরও বেশি দয়ালু হয়ে উঠেন। ক্ষমা করার পর সমপরিমাণ নেকিও লিখে দেন আমাদের আমলের খাতায়। এত এত দয়ালু আর দয়াময় রবকে আমরা কিভাবে ভুলে যাই?

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

> "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?"[২৯]

---

[২৮] সুরা আহযাব : ৭০-৭১

[২৯] সুরা ইনফিতার : ০৬

# ভারসাম্যতার শিক্ষা

সূরা ফাতিহার উপস্থাপনা থেকে সবকিছুতে ভারসাম্যতা রক্ষার সুন্দর একটি দীক্ষা পাওয়া যায়। এই সূরা কুরআনের সারসংক্ষেপ হওয়ায় এর মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণও অনেক। দরকার শুধু দক্ষ ডুবুরির মতো তাদাব্বুরের ভেলায় চড়ে এর গভীরে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তোগুলো আহরণ করা।

যিনি যত প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর, তার প্রতি মানুষের ভয়মিশ্রিত অনুভূতি তত প্রকট থাকে। সূরা ফাতিহার শুরুতে যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হলো, তখন এর দাবি ছিল এই নির্দিষ্টতার কারণটাও তুলে ধরা। সেই দাবি পূরণ করতে গিয়েই 'রব্বিল আলামীন' বা আল্লাহ তাআলা জগৎসমূহের প্রতিপালক হওয়ার প্রসঙ্গ টানা হলো। যেহেতু তিনি পুরো জগৎ-সংসারের প্রতিপালক, তাই প্রশংসাও শুধু তাঁরই প্রাপ্য হবে—এটাই যৌক্তিক।

এত বড় সত্তা, যিনি অকল্পনীয় মহাবিশ্ব ও সমগ্র জগতের নিয়ন্তা, তাঁর কথা শুনে একজন সাধারণ মানুষের ঘাবড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কেননা মানুষের সাধারণ স্বভাব হলো একজন পুলিশ সুপার, মন্ত্রী-এমপি বা বিরাট কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে ভয়মিশ্রিত অনুভূতিতে থাকা।

আল্লাহর পরিচয় উল্লেখ হবার পর সেজন্য একজন মানুষের ভয় পেয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তাই পরক্ষণেই তাকে অভয় দেওয়ার মতো করে বলা হলো 'আর-রহমানির রহীম'। তিনি পরম দয়ালু, অসীম করুণাময়। সুতরাং ভয় পাবার কোনো ব্যাপার নেই। তাঁর মতো দয়া দেখাতে পারবে—এমন আর কেউ নেই।

এত এত দয়ামায়ার কথা শুনে কেউ কেউ যদি সীমা ছেড়ে পুরোপুরি ভয়হীন হয়ে যায়, তাহলে তো আবার মুশকিল। কেননা তখন রবের দয়ার দরিয়ার দিকে তাকিয়ে বান্দা পাপের নদীতে ঝাঁপ দিতে পারে। ভাবতে পারে, অপরাধ করলে অসুবিধা নেই। আল্লাহ হলেন রহমান-রহিম। যা-ই করি না কেন, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। তাই দরকার ছিল বিচার দিবসের ভয়টা ঢুকিয়ে দেওয়া। যেন দয়ার কারণে সে ধোঁকায় না পড়ে যায়। মূলত ভয় ও নির্ভয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ একটা অবস্থানে থাকা হলো কাম্য। কারণ কারও ব্যাপারে একেবারে ভয়ের মধ্যে ডুবে থাকলে তার সামনে কোনো কথা বলাই সম্ভব হয় না। আর একেবারে কোনো ভয়ই যদি না থাকে, তখন আবার তার কথার তেমন দাম দেওয়া হয় না। সেজন্য দয়ামায়ার কথা বলার পর পুনরায় 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' বা বিচার দিবসের মালিক বলে আল্লাহ তাআলা নিজের গুরুগম্ভীর পরিচয়টা তুলে ধরলেন।

দুই দিকে গুরুগম্ভীর ও ভয়মিশ্রিত পরিচয়, আর মাঝে দয়ালু পরিচয়ের ভেতর দিয়ে মূলত বান্দার ভেতরে তাঁর রবের প্রতি একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সূরা ফাতিহাতে আয়াতের ধারাবিন্যাসের এটি অনন্য এক উপমা। বান্দা এই বিষয়টি যত বেশি গভীর থেকে অনুভব করবে, তত দ্রুত সে ভারসাম্যপূর্ণ সেই অবস্থানটা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

গভীরভাবে তাদাব্বুর করলে আরেকটি বিষয়ও বুঝে আসে। তা হলো, আল্লাহ তাআলা বাহিরে বাহিরে যত ডর-ভয় বান্দাকে দেখান, ভেতরে ভেতরে তিনি দয়ার সাগর। তাঁর দয়ার দরিয়ার সামনে রাগ-ক্রোধের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। হাদিসেও বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।'[৩০]

সূরা ফাতিহাতে আমরা যে 'সীরাতে মুস্তাকীম' এর জন্য প্রার্থনা করি, তার একটি বাস্তব রূপ এই সূরাতেই বর্ণনাভঙ্গির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হলো। কারণ সীরাতে মুস্তাকীমের মানে হলো, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িকে এড়িয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। বান্দা তার প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচরণে-উচ্চারণে মধ্যমপন্থাকে গ্রহণ করে নিবে—এটা সূরা ফাতিহার অন্যতম শিক্ষা।

[৩০] সহিহ মুসলিম : ২৭৫১

# বাক্কা নামের রহস্য

মক্কা শহরের নাম শুনেনি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই শহরের অপর একটি নাম আছে, যেটা অনেকের কাছেই অপরিচিত। সেটি হলো বাক্কা। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে মক্কা শহরকে তার পরিচিত নামে উল্লেখ না করে বাক্কা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কী? সেই রহস্য আমরা জানব। তবে তার আগে বাক্কা শব্দের অর্থ সম্পর্কে জেনে নিই।

বাক্কা শব্দের দুইটি অর্থ আছে। এক. ভিড় হওয়া, দুই. কর্তন করা বা উপড়ে ফেলা। মক্কা শহরে এই দুইটি বিষয়ই পাওয়া যায়।

প্রথম বিষয়টি এভাবে পাওয়া যায় যে, পুরো পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে মানুষজন মক্কায় এসে ভিড় জমায়। আল্লাহর ঘর কাবা তাওয়াফ করে। দিন নেই রাত নেই, সব সময় মানুষের ভিড় লেগে থাকে এখানে। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে মক্কা যিয়ারতের তাওফিক দান করেছেন, তারা বিষয়টি ভালো করেই জানেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনের এক জায়গায় বলেছেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

> "এবং যখন আমি কাবাগৃহকে বানালাম মানবজাতির সমাবেশস্থল ও নিরাপত্তাস্থল।"[৩২]

আর দ্বিতীয় বিষয়টি কিভাবে পাওয়া যায় সেটা মোটামুটি সবারই জানা আছে। তা হলো, মক্কা শহরকে যে ধ্বংস করতে চায়, আল্লাহ কুদরতিভাবে তাকে ধ্বংস করেন। তার লেজ কেটে দেন এবং শিকড় উপড়ে ফেলেন। কুখ্যাত আবরাহার

[৩২] বাক্বারা : ১২৫

ঘটনায় আমরা এমনটাই দেখেছি। তাকে সদলবলে এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, আজ তার নাম ছাড়া আর কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই। না তার বংশ, না তার রাজত্ব।

এবার আসি, কুরআনে কেন সকলের কাছে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ শব্দ 'মক্কা'-র পরিবর্তে একটি আয়াতে 'বাক্কা' নামটি ব্যবহার করা হলো—সেই রহস্যের কাছে।

আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাব, যেই আয়াতে মক্কাকে বাক্কা নামে উল্লেখ করা হলো, সেই আয়াতটি ছিল হজ প্রসঙ্গে। আর এটা তো জানা কথাই যে, হজের সময়েই মক্কা থাকে লোকে লোকারণ্য। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে আগমন করা মানুষের পদভারে মুখরিত। ফলে হজের সাথে সম্পর্কিত আয়াতের সাথে বাক্কা নামটিই ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে আয়াতে বাক্কা শব্দের মাধ্যমে মক্কার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা হলো :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

> "নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।"[৩৩]

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো, আয়াতের শুরুতে মানুষের জন্য প্রথম স্থাপিত ঘরের কথা বলা হয়েছে, যাকে আমরা কাবা নামে চিনি। কাবা যখন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই সময় মক্কা ছিল ধু-ধু মরু প্রান্তর। পাথুরে পাহাড় আর বালিয়াড়ি ছাড়া সবুজ-শ্যামলতার কোনো ছোঁয়া সেখানে ছিল না। এই ঘটনার সাথে বাক্কা শব্দের ব্যবহার এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, এই এলাকাতে যদিও এখন কোনো মানুষজন নেই, চারপাশে সব বিরানভূমি; কিন্তু অচিরেই তা লোকে লোকারণ্য ও জনবসতিপূর্ণ হয়ে যাবে।

[৩৩] সুরা আলে ইমরান : ৯৬-৯৭